দৈনিক সংবাদ
004
তারিখ ... JUN 1988 ... পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 3 ...

বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটের ভূমিকা

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট আছে। সারা বছর এসব সিনেটের কোন খবর থাকে না, থাকার কথা নয়; কারণ নিয়মানুযায়ী সিনেট বছরে একবারই বসে থাকে। সেটা হয়ে থাকে জুনের শেষার্ধে। সিনেটের এই বাৎসরিক অধিবেশনে আগামী অর্থবছরের বাজেট পেশ করা হয়। বাজেট আলোচনাকে উপলক্ষ করে সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলার, সমালোচনা করার, পরামর্শ দেবার সুযোগ পান। এছাড়া বিগত বছরের বিস্তারিত ও লিখিত, প্রায়শঃই মুদ্রিত, প্রতিবেদনও এ সময়ে সিনেটের সামনে উপস্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিকের কার্যক্রম পর্যালোচনার এও একটা উপলক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

সিনেট বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনসভা। ষ্ট্যাটিউটের প্রবর্তন ও সংশোধন সিনেটেরই এখতিয়ারভুক্ত, যদিও প্রস্তাবক হল সিণ্ডিকেট। সিণ্ডিকেটের পক্ষ থেকে প্রস্তাব না এলে সিনেট সরাসরি কোন ষ্ট্যাটিউট বিবেচনা করে না।

সিনেট বছরের অন্য সময়েও প্রয়োজনে বসতে পারে, কিংবা নির্ধারিত সংখ্যক সদস্যের স্বাক্ষরে তলবী অধিবেশন হতে পারে।

সিনেটের কক্ষে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ ধৃত ও সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা থাকে। বাৎসরিক অধিবেশনের প্রতিবেদন বিস্তারিত হবে, কি সংক্ষেপিত হবে, সেটা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিষয়। প্রতিবেদনকে প্রয়োজনীয় কাটছাঁট করে সুসহ ও বহনযোগ্য করার ব্যবস্থা কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত হয়েছে।

উপরের বর্ণনা থেকে পরিস্কার যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট একটা আইনসভার আদর্শে গঠিত, ও একটি আইনসভার নিয়মে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদি পর্বে সিনেটের নাম ছিল কোর্ট, পরে এ নাম পরিবর্তিত হয়ে সিনেট হয়। পরিবর্তনের কারণ কি ছিল আমার জানা নেই। অনেক বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও ওই অঙ্গটি কোর্ট নামেই চালু আছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী পর্ষদকে আদিপর্বে "এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল" বলা হতো; পরবর্তী সময়ে সেটা সিণ্ডিকেট নাম গ্রহণ করেছে।

নামের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু দু'টি অঙ্গের গঠন ও দায়িত্ব মোটামুটি যেমন ছিল, তাই আছে। সিণ্ডিকেট ও সিনেটের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় আইনে পরিস্কারভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। দৈনন্দিন প্রশাসনে, এমনকি নিয়োগ, পদোন্নতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও সিনেটের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। সিণ্ডিকেটে সিনেটের মনোনীত/নির্বাচিত একাধিক প্রতিনিধিই ওই নির্বাহী পর্ষদে সিনেটের চক্ষু-কর্ণের কাজ করেন।

সিনেটে কমবেশী একশ' সদস্য/সদস্যার সর্বাধিক হল বিশ্ববিদ্যালয়ের তেত্রিশ জন নির্বাচিত শিক্ষক, তার পরই নিবন্ধীকৃত গ্রাজুয়েটদের পঁচিশজন প্রতিনিধি। এছাড়া সরকারী মনোনয়নে, পদাধিকার বলে, জাতীয় সংসদ স্পীকারের মনোনয়নে ও ছাত্র সংসদের (যদি চালু থাকে) প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য নিয়ে সংসদ পূর্ণাঙ্গ হয়। বিভিন্ন মহলের প্রতিনিধিত্বকারী একটি ব্যাপকভিত্তিক ও সর্বোচ্চ ক্ষমতাশীল সংস্থা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় নামধারী প্রতিষ্ঠানে সিনেটের অবস্থান শীর্ষে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিবদ্ধ-নিয়মিত-দৈনন্দিন কার্যকলাপে সিনেট হস্তক্ষেপ করে না। উচ্চতর ও অভিভাবক স্থানীয় অঙ্গ হিসেবে সিনেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনার উপর দৃষ্টিপাত করে, সার্বিক অগ্রগতির দিক-নির্দেশনা করে এবং বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ককে তুলে ধরে। যদিও অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদনের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে পেশ করার নিয়ম নেই, তবে চ্যান্সেলর পরিচয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে এই প্রতিবেদন যায়। দেশের সরকারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক গভীর। বিশ্ববিদ্যালয় আইনের উপর চোখ বুলালেই প্রশাসনের ও কার্যক্রমের বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ অঙ্গ হিসেবে সিনেটের সদস্য নির্বাচনে বিস্তর আগ্রহ ও প্রতিযোগিতা দেখা যায়। এর একটি প্রধান কারণ হল, সিনেটে নির্বাচিত তিন সদস্যের প্যানেল থেকেই চ্যান্সেলর একজনকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করবেন,—এই ব্যবস্থা আছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে উপাচার্যের যে কেন্দ্রীয় ভূমিকা--যা পূর্বেও ছিল, এখনও আছে--সেজন্যই সিনেটের যে অধিবেশনে উপাচার্যের প্যানেল গঠিত হয় সেটা প্রায়শঃই অতিরিক্ত গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

সিনেট গঠনে বিভিন্ন ভাগে যেভাবে সদস্যসংখ্যা নিরূপিত হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বিতর্কিত হল নিবন্ধীকৃত গ্র্যাজুয়েটদের মধ্য থেকে পঁচিশজন সদস্যর নির্বাচন। সংখ্যায় এই দলটি দ্বিতীয় বৃহত্তম দল--সম্পূর্ণ সিনেটের চার ভাগের একভাগ। যে--নিয়মে এই সদস্যরা নির্বাচিত হন--ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত না হতে পারলে ডাক-ভোটেও এরা অংশগ্রহণ করতে পারেন--তার ফলে সাম্প্রতিককালে ব্যাপক দুর্নীতির খবর এসেছে। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, অন্য তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে যে ধরনের কারচুপির আশ্রয় নেয়া হচ্ছে, তার ফলে সিনেটের মত একটি সম্মানীয় সংগঠনের সুনাম ক্ষুন্ন হয়েছে। এবং তা স্পর্শ করছে শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়কেই।

জুনের শেষার্ধে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে, বা হতে যাচ্ছে। বাজেটের উপস্থাপন বা আলোচনায় প্রস্তাবিত বাজেটের খুব বেশী ইতরবিশেষ হয় না। এটা এক ধরনের আনুষ্ঠানিকতা। এর গুরুত্ব শুধু এটুকুই যে, এ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম নিয়ে সদস্যরা তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন এবং উপাচার্য, যিনি স্পীকারের দায়িত্ব পালন করেন, তিনি চাইলে এসব সমালোচনার সদর্থক দিক থেকে প্রয়োজনীয় ধারণা পেতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে প্রশাসনের যোগাযোগ যেমন নিবিড়, পরিবার-বহির্ভূত সদস্যদের সঙ্গে তেমন নয়। এই সকল সদস্যের প্রতিক্রিয়া-পরামর্শ গ্রহণের এই একটা সুযোগ সিনেটের অধিবেশন সৃষ্টি করে। এবং নিঃসন্দেহে এটা প্রশাসনের জন্য উপকারী। ছাত্র সদস্যরা তাদের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিকোণ থেকে যে সমালোচনা নিয়ে আসে, তাও এক মূল্যবান অবদান সিনেটের কার্যক্রমে। কেবলমাত্র উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বলে ছাত্রসমাজের যে ভুল পরিচয় সমাজে চালু আছে, সিনেটে ছাত্রদের আলোচনার ধারা ও সুর লক্ষ্য করলে যে ভুলের অবসান ঘটবে।

সিনেট একটি গণতান্ত্রিক ধারণার প্রতিমূর্তি। পঁচিশজন নিবন্ধীকৃত গ্রাজুয়েট-প্রতিনিধি নির্বাচন নিয়ে ও ডাক-ভোটের দুর্নীতিমূলক ব্যবহার নিয়ে সমালোচনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডাক-ভোট প্রত্যাহার করার কথা বিবেচনা করছে। সংবাদপত্রে এধরনের একটা খবর বেরিয়েছে। সম্পূর্ণ বিষয়টি পর্যালোচনা করে এ উদ্দেশ্যে গঠিত একটি কমিটি তাদের সুপারিশ পেশ করলে হয়তো প্রয়োজনীয় সংশোধন হবে। এই পদক্ষেপকে একটি সময়োপযোগী ও সুস্থ পদক্ষেপ বলতে হবে। এবং আশা থাকবে, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও এ বিষয়ে কিছু করবেন, কারণ কথিত দুর্নীতি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ নয়।

জনমানসে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভাবমূর্তি নানাভাবে কলঙ্কিত হয়েছে। যে দোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, তাও চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তার ওপর। তবে সব দোষই যদি বিশ্ববিদ্যালয় অন্যের ওপর চাপায়, তাও সকলে গ্রহণ করবে না। যে ক্ষেত্রে সংস্কার প্রয়োজন এবং যে সংস্কার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর থেকে নিজস্ব উপলব্ধির উৎস থেকে জন্ম নেবে, উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হবে না, সেগুলোই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থবিরতা মোচনে সহায়ক হবে এবং জনমানসে বিশ্ববিদ্যালয়কে দায়িত্ব-সচেতন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতি, বয়স, নিবন্ধীকৃত গ্রাজুয়েটদের মোট সংখ্যা বিবেচনা করে সিনেটের মধ্যে ওই শ্রেণীর সদস্যদের সংখ্যা নিরূপিত হয়নি। ঢালাওভাবে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পঁচিশজন নিবন্ধীকৃত গ্রাজুয়েট সদস্য থাকবে, এটা কোন যুক্তির কথা নয়। যেক্ষেত্রে তেত্রিশজন শিক্ষক প্রতিনিধির ব্যবস্থা আছে, সে ক্ষেত্রে আবার অন্য পরিচয়ে আরও শিক্ষক সিনেটের সদস্য হতে পারবেন, এও সম্ভবতঃ আইন প্রণয়নকারীদের অভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু আইনের অস্পষ্টতার কারণে এটা সম্ভব হচ্ছে। সিনেটের সদস্য-বন্টনে ক্যাটাগরি'র ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং ধরে নিতে হবে পঁচিশজন রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটদের ভাগে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকেরা ভাগ বসাবেন না। কর্মকর্তারা বসাতে পারেন, কারণ তাঁদের প্রতিনিধিত্বের কোন আলাদা ব্যবস্থা নেই।

সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্বকারী ও উচ্চশিক্ষা বিষয়ে সন্দেহাতীতভাবে অভিজ্ঞ ও আগ্রহী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত সিনেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সুস্থ পরিচালনায় ও দিকনির্দেশনায় যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। সিনেট একটি বিপর্যস্ত সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় আদর্শ স্থাপন করবে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের কাছে দেশের এই আজ ন্যূনতম প্রত্যাশা।